مِنْ كُلِّيَاتِ رَسَائِلِ النُّورِ

(اَلْآيَةُ الْكُبْرَى)

مُشَاهَدَاتُ سَائِحٍ يَسْأَلُ الْكَوْنَ عَنْ خَالِقِهِ

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

আল্লাহর অভিনব নিদর্শন

(আয়াতুল-কুবরা'র বাংলা অনুবাদ)

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী
বাংলা অনুবাদ : মামুন ইবনে ইসমাঈল
সম্পাদনা : আহ্‌মদ বদরুদ্দীন খান

Allahar Ovinobo Nidorshon (Ayet-ul Kubra)

Bediuzzaman Sayed Nursy
Translated in Bengali : Mamun Ibn Ismail
Edited: Ahmed Badruddin Khan

প্রকাশক

সোজলার পাবলিকেশন্স লিঃ
SOZLER PUBLICATION LTD.
এইচ. এম. প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা) সড়ক নং-০২, সেক্টর-০৩
উত্তরা, ঢাকা, মোবাইল : ০১৬৭৬৫১৮৯৮৭, ০১৭৬৭৮২২০৬৪
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১৫ খ্রীস্টাব্দ
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১৮ খ্রীস্টাব্দ

পরিবেশক

মাসিক মদীনা পাবলিকেশান্স
The Monthly Madina Publication
৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০২-৭১১৯২৩৫

মূল্য : ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা।

আয়াতুল-কুবরা'র বাংলা অনুবাদ 'আল্লাহর অভিনব নিদর্শন' গ্রন্থ সম্পর্কে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও সীরাত সাহিত্যের অগ্রপথিক মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁনের

অনুভূতি

সাম্প্রতিককালের তুরস্কের মহামণীষী সাঈদ নূরসী (রাহ্.) তাঁর দেশবাসী তথা পাশ্চাত্যের মুসলিম জনগণের মধ্যে "বদিউজ্জামান" নামে অভিহিত হয়েছেন, যার অর্থ কালের বিস্ময়। বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ, উসমানীয় খেলাফত ব্যবস্থা অবসানের পর যারা এই ঐতিহ্যবাহী মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা সে দেশ থেকে ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতির সবকিছু ধুয়ে-মুছে দেশকে ইসলাম-শূণ্য করে দিয়েছিলো। এক পর্যায়ে আযান-নামায পর্যন্ত বেআইনী ঘোষিত হয়েছিল। যে তুরস্ক ছিল চার শতাধিক বছরব্যাপী ইসলামী খেলাফতের পরিচালক এবং মুসলিম মিল্লাতের একচ্ছত্র নেতৃত্বের ধারক ও বাহক, সেই তুরস্ক পরিণত হয়েছিল ইসলামের নাম-নিশানা উৎখাত করার অগ্রসৈনিকরূপে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ মুসলমানদের ত্রাণকর্তা হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন মহামণীষী সাঈদ নূরসীকে। তাঁর নিরব সাধনার ফলশ্রুতিতে আজ তিনি "বদিউজ্জামান" সাঈদ নূরসী তথা কালের বিস্ময়রূপে প্রতিয়মান হচ্ছেন। সাঈদ নূরসী তাঁর কলমের দ্বারা দিকভ্রান্ত তুর্কীজাতি তথা পাশ্চাত্যের মুসলমানদের মধ্যে একজন স্বীকৃত মোজাদ্দিদের স্থান দখল করেছেন। তাঁর লেখা বইগুলো আজ শুধু তুর্কী জনগণের মধ্যে নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যেই নতুন চেতনা এবং বোধ-বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছে। বাংলাভাষায় সাঈদ নূরসীর গ্রন্থাবলী অনুবাদ শুরু হয়েছে, এটি অনূদিত গ্রন্থাবলীর তৃতীয় গ্রন্থ। আমার বিশ্বাস এই বইগুলো বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের ঈমানের জগতে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে। আমি এই গ্রন্থখানার অনুবাদক ও প্রকাশককে মোবারকবাদ জানাই।

(মুহিউদ্দীন খাঁন)
সম্পাদক : মাসিক মদীনা, ঢাকা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর	৭
আল্লাহর অভিনব নিদর্শন : কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য ও তার ব্যাখ্যা	১১
ভূমিকা	১৩
প্রথম সংশয় ও জটিলতা এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় : এখানে দু'টি আলোচনা রয়েছে	১৪
প্রথম আলোচনা : বাস্তবতা বনাম অস্বীকার	১৪
পূর্বের আলোচনার সারকথা	১৬
দ্বিতীয় আলোচনা : তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনের কথাই গ্রহণযোগ্য	১৭
ঈমান	১৯
দ্বিতীয় সংশয় ও জটিলতা এবং উত্তরণের উপায় : এখানেও দু'টি আলোচনা রয়েছে	২০
প্রথম অধ্যায় : অস্তিত্বের প্রমাণ	২৩
বায়ুমণ্ডল	২৭
মেঘমালা	২৭
বাতাস	২৮
বৃষ্টি	২৮
বিজলী ও গর্জন	২৮
পৃথিবী	৩৩
সারাংশ	৩৪
সমুদ্র	৩৫
সমুদ্র-গর্ভ	৩৬
নদী-নালা	৩৬
পর্বতমালা ও মরুভূমি	৩৮
গাছপালা ও তৃণ-উদ্ভিদ-জগত	৪০
প্রথম বাস্তবতা : কাঙ্ক্ষিত নেয়ামত ও সম্মানদানের বাস্তবতা	৪০
দ্বিতীয় বাস্তবতা : প্রাজ্ঞিক নিরূপণের বাস্তবতা	৪০
তৃতীয় বাস্তবতা : সৃষ্টির আকৃতি উন্মোচন ও প্রস্ফুটিত হওয়ার বাস্তবতা	৪১

- পশু-পাখীর জগত ৪২
- প্রথম বাস্তবতা : প্রাণ ও জীবনদানের বাস্তবতা ৪৩
- দ্বিতীয় বাস্তবতা : আকৃতিদানের বাস্তবতা ৪৩
- তৃতীয় বাস্তবতা : গঠন-আকৃতি প্রস্ফুটিত করার বাস্তবতা ৪৩
- মানব-জগত ৪৫
- মুহাক্কিক ও জ্ঞানে সুগভীর তথা মুজতাহিদ, আসফিয়া ও সিদ্দিকীন ৪৭
- নেককার মহান মুরশিদ আউলিয়াগণ ৪৯
- ফেরেশ্‌তাদের অস্তিত্ব ৫০
- আলোকিত সঠিক বিবেকবুদ্ধি ও নিরাপদ নূরানী অন্তর ৫১
- ওহীয়ে ইলাহী ৫৪
- ইলহাম ও ওহীর মধ্যে পার্থক্য ৫৬
- ঐশ্বরিক ভালোবাসা ৫৭
- জগত-গৌরব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচিতি ৫৯
- প্রথম দলীল : রাসূল (সা.)-এর স্বতন্ত্র মু'জিযা ৬০
- দ্বিতীয় দলীল : কোরআনুল কারীম ৬০
- তৃতীয় দলীল : স্বভাব-প্রকৃতির ধর্ম ৬১
- চতুর্থ দলীল : অন্যান্য নবী-রাসূলের ঐক্যমত ৬৩
- পঞ্চম দলীল : ওলী-আওলিয়াগণের ঐক্যমত ৬৩
- ষষ্ঠ দলীল : মহামনীষীগণের ঐক্যমত ৬৪
- সপ্তম দলীল : সাহাবীগণের ঐক্যমত ৬৪
- অষ্টম দলীল : বিশ্বজগতের দাবি ৬৫
- নবম দলীল : সুসজ্জিত সৃষ্টিকর্ম ও অলঙ্করণের দাবি ৬৫
- পথিকের সিদ্ধান্ত ৬৬
- প্রথম : সর্বজন গ্রহণযোগ্য মত ৬৬
- দ্বিতীয় : সর্বজন গ্রহণযোগ্য মত ৬৭
- তৃতীয় : সর্বজন গ্রহণযোগ্য মত ৬৭
- কোরআনুল কারীমের পরিচিতি ৬৮
- প্রথম দ্রষ্টব্য : রাসূল (সা.)-এর সত্যায়ন ৬৯
- দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য : আমূল পরিবর্তন ৬৯

- তৃতীয় দ্রষ্টব্য : সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব ৭০
- চতুর্থ দ্রষ্টব্য : মধুময় বর্ণনা ৭৩
- পঞ্চম দ্রষ্টব্য : প্রভাব বিস্তার ৭৩
- ষষ্ঠ দ্রষ্টব্য : সর্বময় আলোকিত ৭৪
- জগত পরিচিতি ৭৮
- প্রথম : সম্ভাব্যতা ও নশ্বরতার হাকিকত ৭৯
- দ্বিতীয় : সহযোগিতার হাকিকত ৮১
- প্রথম : সর্বময় প্রভাব বিস্তারকারী কার্যক্ষমতার হাকিকত ৮৩
- দ্বিতীয় : আল্লাহর কথামালার বাস্তবতা ৮৭
- সতর্কতা ৮৯
- দ্বিতীয় অধ্যায় : তাওহীদের প্রমাণ ৯০
- প্রথম হাকিকত : একচ্ছত্র ইলাহ্ হওয়া ৯০
- দ্বিতীয় হাকিকত : একচ্ছত্র প্রতিপালন ক্ষমতা ৯১
- তৃতীয় হাকিকত : পূর্ণাঙ্গ হওয়ার বাস্তবতা ৯১
- চতুর্থ হাকিকত : একচ্ছত্র শাসন-ক্ষমতা ৯২
- প্রথম হাকিকত : আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের হাকিকত ৯৫
- দ্বিতীয় হাকিকত : আল্লাহর কার্যাবলী নিরঙ্কুশভাবে প্রকাশ পাওয়া ৯৭
- তৃতীয় হাকিকত : অভিনবরূপে অস্তিত্বে আনা ও সৃষ্টি করা ১০০
- প্রথম রহস্য : বিপরীত দুটি বস্তুর সমন্বয়ের অসম্ভাব্যতা ১০১
- দ্বিতীয় রহস্য : তাজাল্লীর বিকীরণ ১০২
- চতুর্থ হাকিকত : সমস্ত অস্তিত্বকে একসাথে একত্র ও প্রকাশ করা ১০৫
- পঞ্চম হাকিকত : পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন উপাদানের একত্ব ১০৭
- প্রথম হাকিকত : ফাত্তাহ্ অর্থাৎ, উন্মোচনকারী হওয়ার হাকিকত ১১২
- দ্বিতীয় হাকিকত : 'রাহমান' হওয়ার হাকিকত ১১৪
- সারকথা ১১৬
- তৃতীয় হাকিকত : পরিচালনা করা বা ব্যবস্থাপনার হাকিকত ১১৭
- চতুর্থ হাকিকত : 'রাহীম' ও 'রায্যাক' হওয়ার বাস্তবতা ১১৯
- হে রব ১২৫
- রিসালায়ে নূরের গুরুত্ব ১২৬

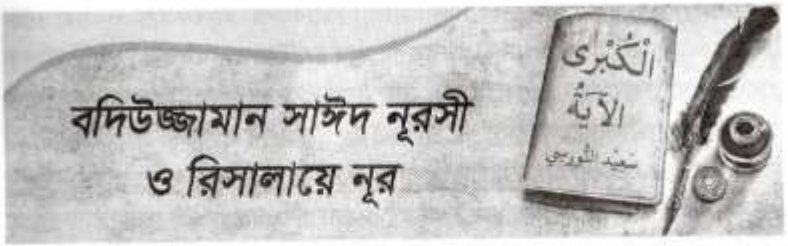

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ১৮৭৬ সালে পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের নুরস্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পথ মাড়িয়ে ৮৪ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে উরফায় ইন্তেকাল করেন।

তিনি অতি উচ্চস্তরের আলেম ছিলেন, যিনি প্রথাগত দ্বীনি বিষয় ছাড়াও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত ছিলেন। যৌবনেই তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন এবং বদিউজ্জামান (কালের বিস্ময়) খেতাব অর্জন করেন। বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর জীবনকাল উসমানী খেলাফত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও বিভাজন। ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র গঠন এবং এর পরের ৩৭ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত অর্থাৎ, ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী মানবতার জন্য ইসলামের পথে সংগ্রাম করেন। তিনি অগণিত ছাত্রকে শিক্ষাদান এবং সমকালীন প্রথম সারির আলেমদের সঙ্গে বিভিন্ন দ্বীনি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা ছাড়াও পূর্ব তুরস্কে রুশ সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। রুশদের বিরুদ্ধে দুই বছর যুদ্ধে সক্রিয় থাকার পর যুদ্ধাহত অবস্থায় তিনি বন্দী হন। বন্দীত্ব থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভের পর ইসলামের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য জনজীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। অতপর যে বছরগুলোতে উসমানী খিলাফত ভেঙ্গে তা প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ করে সেই বছরগুলোতেই তিনি "পুরাতন সাঈদ" থেকে "নতুন সাঈদ"-এ রূপান্তরিত হন। "নতুন সাঈদ"-এ রূপান্তর ছিল তাঁর জন্য জনজীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পড়াশুনা ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকা, যা তখন ছিল এক নতুন ধরনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি।

দুই বছর পরে অর্থাৎ, ১৯২৫ সালে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর দ্বীনহীন কর্মকাণ্ড ও দমন নীতির বিরোধিতা করায় তাঁকে পশ্চিম আনাতোলিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। পরের সাতাশ বছরের জীবন শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, হয়রানি এবং কারাদন্ড ভোগ করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। কিন্তু কারাদণ্ড ও নির্বাসনের এই বছরগুলোতেই প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠার "রিসালায়ে নূর গ্রন্থসমগ্র" লিখিত হয় এবং সমগ্র তুরস্কে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাঈদ নূরসী নিজেই বলেন, "এখন

আমি স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি যে, আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই নিজ ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, উপলব্ধি এবং ইচ্ছার বাইরে এমনভাবে পরিচালিত হয়েছে- যা কোরআনের খেদমতের জন্যই ব্যয়িত হয়েছে। জ্ঞানচর্চায় ব্যয়িত আমার সমগ্র জীবন যেন ছিল "রিসালায়ে নূর" লেখার প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র।"

মুসলিম বিশ্বের অধঃপতনের মূল কারণ ছিল ঈমানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া, একথা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী বুঝতে পেরেছিলেন। এই দুর্বলতার সাথে বস্তুবাদ ও দ্বীনহীনতা এবং অন্য সকল শক্তির আক্রমণ এক হয়ে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ঈমানের ভিত্তিকে আরোও দুর্বল করে দেয়। ফলে তাঁর এই বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ঈমানকে মজবুত করা এমনকি বাঁচিয়ে রাখাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জরুরি এবং প্রধান কাজ। সে সময় যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে ইসলামের ইমারতকে তার ভিত্তিতে পুনঃনির্মাণ করার নিমিত্তে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং কলমের জিহাদের মাধ্যমে সকল আক্রমণকে প্রতিহত করা।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর নির্বাসিত ও বন্দী জীবনে রচিত "রিসালায়ে নূর" আধুনিক মানুষের কাছে ঈমানের মৌলিক বিষয় ও কোরআনের হাকিকাতসমূহকে ব্যাখ্যা করে। তাঁর নিয়ম ছিল ঈমান ও কুফর দুটিকেই যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। তিনি এটাও দেখান যে, কোরআনের নিয়ম অনুরসণ করেই ঈমানের হাকিকাত, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, রিসালাত এবং সশরীরে পুনরুত্থান এ সবই প্রমাণ করা সম্ভব। কারণ, এই সত্যসমূহ বিশ্বজগৎ এবং মানবকূলের সৃষ্টি ও অস্তিত্বেরও যথাযথ ব্যাখ্যা।

বিভিন্ন গঠন-মূলক কাহিনী, উপমা, ব্যাখ্যা এবং জোরালো যুক্তির মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করেন যে, দ্বীনের হাকিকাত আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বিজ্ঞান ১৪'শ বছর পিছনে থেকে দ্বীন তথা কোরআনকে অনুসরণ করছে। বস্তুতঃ "রিসালায়ে নূর"-এ তিনি এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, বিশ্বজগতের কর্মকাণ্ড বিষয়ক বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধকর আবিষ্কার দ্বীনের হাকিকাতকেই বরং মজবুত করে।

রিসালায়ে নূরের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী নিজেই তুরস্কের ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে ইসলামি আকীদা ও ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করেন; এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর এই ভূমিকার গুরুত্ব বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও "রিসালায়ে নূর" শুধুমাত্র যে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান দেয় তাই নয় বরং সমস্ত মানবকূলের জন্যেও তা বেশ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ "রিসালায়ে নূর" লেখা হয়েছে আধুনিক মানুষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য

রেখে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জড়বাদী দর্শনে আচ্ছন্ন কোনো ব্যক্তির মনে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ ও তাঁর মনোনীত দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়, "রিসালায়ে নূর" তার সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। এটা আধুনিক মানুষের সকল "কি, কেন, কিভাবের" উত্তরও দিয়ে দেয়।

"রিসালায়ে নূর" ঈমানের অতি গভীর বিষয়বস্তুসমূহ সাধারণ মানুষের জন্য এমন সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করে যে, নবীনরাও তা বুঝতে পারে এবং তা থেকে ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ ইতিপূর্বে ঈমানের এ সমস্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর বিষয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমগণই পড়াশুনা করতেন। বিশ্বজগৎ এবং মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রিসালায়ে নূরে এ কথা প্রমাণ করেন যে, প্রকৃত সুখ ঈমান এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের মাঝে নিহিত রয়েছে। তিনি এও দেখিয়ে দেন যে, অশান্তি ও যন্ত্রণা যা কুফরের মাধ্যমে জন্ম নিয়ে মানুষের রূহ এবং ক্বালবকে আচ্ছন্ন করে তা শুধুমাত্র প্রকৃত ঈমানের দ্বারাই নিবৃত করা সম্ভব।

পবিত্র কোরআন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সম্বোধন করে। এই প্রজ্ঞাময় কিতাব মহাবিশ্ব এবং এর সতত সঞ্চরণশীল ও পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- যাতে সে মাখলুক হিসেবে তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পারে। রিসালায়ে নূরে সাঈদ নূরসী শিক্ষাদানের এই কার্যকর পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। তিনি মহাবিশ্বের প্রকৃত রূপকে মহান স্রষ্টার নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এই আয়াতসমূহ যদি পাঠ করা হয় তাহলে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের হাকিকাত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি এমন প্রকৃত ও মজবুত ঈমানের স্তরে পৌছতে সক্ষম হয়- যা প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের সূক্ষ্ম বেড়াজাল থেকে উদ্ভূত সংশয়সমূহের মোকাবেলা করতে সক্ষম। সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির অর্থ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করা। এই কায়েনাত তথা বিশ্বজগতকে যদি এক বিশাল গ্রন্থরূপে দেখা হয়- যার প্রতিটি অক্ষর "গ্রন্থপ্রণেতা"র প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তাহলে তা ঈমানের বুনিয়াদকে শুধু মজবুতই করে না, বরং তাকে আরো গভীর ও সম্প্রসারিতও করে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে এমন এক দ্বীন, যার মাধ্যমে সে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্কে তাঁর সকল সুন্দরতম নাম ও গুণাবলিসহ চিনতে সক্ষম হয়। "রিসালায়ে নূর" মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পরিচিতি সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছে। এটা মুসলমানদেরকে অনুকরণ নির্ভর (তাকুলিদি) ঈমান থেকে প্রকৃত (তাহকিকি) ঈমানের দিকে ধাবিত করে। অমুসলিমদেরকে সৃষ্টির

উপাসনা থেকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। মহা প্রজ্ঞাময় কোরআনের পথ দেখায়।

"রিসালায়ে নূর" প্রচলিত তাফসিরসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের একটি তাফসীর গ্রন্থ। এটি কোরআনের সকল আয়াতের তাফসীর নয় বরং কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়।

সর্বোপরি, রিসালায়ে নূরের প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যকে গভীরভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধির মাধ্যমে পাঠ করার জন্য সম্মানিত পাঠক/পাঠিকাদের প্রতি আমাদের সবিনয় অনুরোধ রইল।

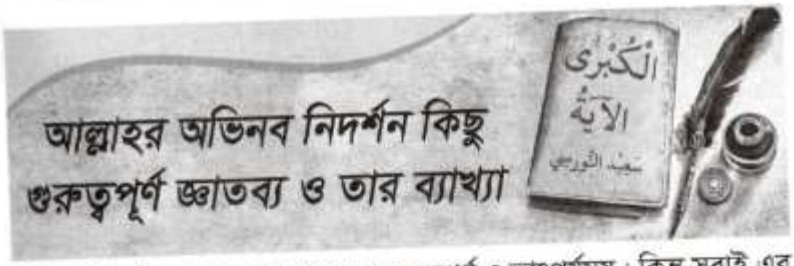

আল্লাহর অভিনব নিদর্শন কিছু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য ও তার ব্যাখ্যা

যদিও এই বইয়ের আলোচনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। কিন্তু সবাই এর প্রত্যেকটি আলোচনা বুঝতে পারবে না। তবে প্রত্যেকেই এখান থেকে নিজ অংশ লাভ করতে পারবে। যেমন- এক লোক একটি বাগানে প্রবেশ করল কিন্তু সেই বিশাল বাগানের সব ফল সে একা নিতে পারবে না। তবে সে যা-ই নিতে পারবে, তা-ই তার জন্য লাভ। কারণ, বিশাল বাগান তো শুধু তার একার জন্যে নয় বরং তাদেরও জন্যে, যারা আরো বেশি নিতে পারবে।

যাই হোক, আলোচ্য গ্রন্থে এমন পাঁচটি বিষয় রয়েছে যা এই বইয়ের মৌলিক তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বুঝার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

এক. আমি আমার চারপাশের দেখা বিষয়গুলোর আলোচনাই এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি, ঠিক যেমন করে বুঝেছি তেমন করে লেখার চেষ্টা করেছি। আমি এটা নিজের মতো করে আমার জন্যে লিখেছিলাম। ফলে অন্যান্য বইয়ের মতো সকলের বুঝার উপযোগী করে বিষয়গুলো প্রথম পর্যায়ে লেখা হয়নি।

দুই. মূলতঃ ইসমে আযমের আলোকে অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসরে প্রকৃত তাওহীদকে এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই এর প্রতিটি বিষয়-ভিত্তিক আলোচনা খুবই ব্যাপক, সুগভীর ও দীর্ঘ। সেজন্যে সবাই এ গ্রন্থ প্রথমবার পাঠ করেই এতে আলোচিত সকল বিষয় আয়ত্ত করতে পারবে না।

তিন. আসলে প্রতিটি আলোচনায় রয়েছে সুদীর্ঘ এক হাকিকত এবং বাস্তবতার ছোঁয়া। হাকিকতকে একসূত্রে আবদ্ধ করায় এবং বিভক্ত না করায় একটি পৃষ্ঠা একটি দীর্ঘ বাক্যে পরিণত হয়েছে। ফলে শুধু একটি প্রামাণিক আলোচনায় অনেক ভূমিকা সন্নিবেশিত হয়েছে।

চার. এই পুস্তকের অধিকাংশ আলোচনার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য অসংখ্য দলীল বর্ণিত হয়েছে। একটি দলীল উল্লেখ করতে গিয়ে অনেক সময় দশ থেকে বিশটি দলীলও উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে আলোচনা দীর্ঘ ও লম্বা হয়ে গিয়েছে, যা স্বল্পজ্ঞানের অধিকারীরা তা বুঝার ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হতে পারেন।

পাঁচ. আমি রমযান মাসের বরকত দ্বারা এ গ্রন্থের নূরসমূহকে লাভ করেছি।

তবে লেখার ক্ষেত্রে একটু তাড়াহুড়োর কারণে প্রথম খসড়াতেই শেষ করতে হয়েছে। তাছাড়া এ গ্রন্থ রচনাকালীন আমি বিভিন্ন দিক থেকে শারীরিক অসুস্থতা ও মানসিক দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন ছিলাম এবং লেখার সময়েই আমি উপলব্ধি করছিলাম যে, এই পুস্তকের কিছু আলোচনা আমার অন্তরে এমনভাবে উদয় হচ্ছিল যে, এগুলো আমার ইচ্ছা ও কল্পনায় এর আগে ছিল না। তাই আমি এতে আমার চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী কিছু সংশোধন ও পরিমার্জন করা সঙ্গত মনে করিনি। আর এ জন্যেই বইটি যেভাবে প্রথমে লেখা হয়েছিল পরবর্তী সময় সেভাবেই রাখা হয়েছে। তাই অনেকেই বুঝতে কিছুটা জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাছাড়া আরবী ভাষায় লিখিত প্রথম মাকামের অনুচ্ছেদসমূহের সার-নির্যাস এতে নতুন করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এই পাঁচ ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা মৌলিক সমস্যা যা-ই বলা হোক-না কেন তা সত্ত্বেও এ গ্রন্থ অনেক গুরুত্বের দাবি রাখে।

এই বইটি আল্লাহর সুমহান আয়াতের (০০১) একটি হাকিকত। তার বড় বড় নিদর্শনসমূহের একটি বাস্তবতা এবং সেগুলোর প্রামাণ্য ব্যাখ্যা। এ গ্রন্থ আশ-শুয়াআত গ্রন্থ-সমগ্রের সপ্তম শুয়া এবং 'আসায়ে-মূসা' নামক রচনাসমগ্রের প্রথম ঈমানী প্রমাণপুঞ্জ।

আলোচ্য এই সপ্তম শুয়া মূলতঃ দু'টি অধ্যায় ও একটি ভূমিকার সমন্বয়ে গঠিত। আলোচ্য ভূমিকায় চারটি সুস্পষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : কোরআনের সুমহান আয়াতের (০০২) তাফসীর ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এতে প্রথম অধ্যায়ের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রমাণ করা হয়েছে।

সামনের ভূমিকা দীর্ঘ করা এবং তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করার আসলে আমার ইচ্ছা ছিল না। যদিও একটু ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল, তাই এভাবে লিখিয়ে নেয়া হয়েছে। অনেকেই আবার এই দীর্ঘ ভূমিকাকেও সংক্ষিপ্ত মনে করেছেন।

সাঈদ নূরসী

০০১. উক্ত আয়াতটি হলো সূরা বনী ইসরাঈলের ৪৪ নাম্বার আয়াত।
০০২. উক্ত আয়াতটি হলো সূরা বনী ইসরাঈলের ৪৪ নাম্বার আয়াত।

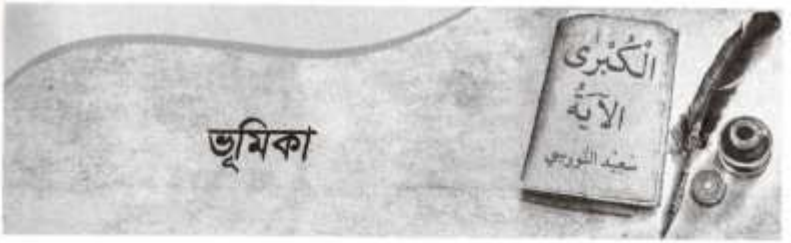

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (سُورَةُ الذَّارِيَاتِ : ٥٦)

"আমার ইবাদত করার জন্যেই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬)

উল্লিখিত আয়াতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য থেকে বুঝা যায় যে, এই পৃথিবীতে মানবজাতি প্রেরণের হেকমত ও উদ্দেশ্য হলো, 'খালেকে কায়েনাত' তথা জগৎস্রষ্টার পরিচয় জানা। তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং একমাত্র তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা। যেমনিভাবে মানবপ্রকৃতির দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌কে জানা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বকে পূর্ণাঙ্গ ও দৃঢ়ভাবে সত্যায়ন করা।

হ্যাঁ, যে দুর্বল মানুষ স্বভাবতই খুজে বেড়ায় অনন্ত অসীম জীবন, চিরস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সীমাহীন আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনা ও আল্লাহর পরিচয় পাওয়া ছাড়া তার কাছে সকল বস্তু ও সকল পূর্ণতা তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হয়। বরং তার কাছে সেসব বস্তুর অধিকাংশেরই কোনো মূল্য থাকে না। অনন্ত অসীম সুখময় জীবনের মূল ও চাবিকাঠি যে ঈমান, সে ঈমান ছাড়া তার কাছে আর কিছুই যেন ভালো লাগে না। একজন মুমিনের তো বটেই বরং একজন প্রকৃত মানুষের চিন্তা-ভাবনা এমনই হওয়া উচিত।

রিসালায়ে নূর যেহেতু এই বাস্তবতাকেই পূর্ণাঙ্গ ও সুস্পষ্টভাবে অকাট্য দলীল-প্রমাণ দিয়ে বর্ণনা করে, তাই আমরা রিসালায়ে নূরের অন্যান্য বইয়ের দিকে ইঙ্গিত করলাম। আমরা এখানে প্রথমে দু'টি সংশয় ও জটিলতা উল্লেখ করব- যা সচরাচর এ যুগের ঈমানী বিশ্বাস ও চেতনাকে দুর্বল ও নড়বড়ে করে দিচ্ছে। ঈমানী চেতনা ধারণ করার ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও অবিচলতা সৃষ্টি করছে। এই 'সংশয়' ও 'জটিলতা'র সমাধান-কল্পে চারটি আলোচনা সন্নিবেশিত রয়েছে।

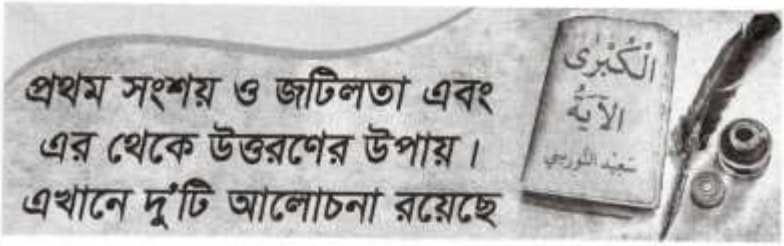

প্রথম আলোচনা : বাস্তবতা বনাম অস্বীকার

ইতোপূর্বে (রিসালায়ে নূরের একত্রিশতম মাকতুবের তেরোতম লামআতে) বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত কোনো বিষয়ের সামনে সাধারণ ব্যাপক কোনো বিষয়কে অস্বীকার করার কোনো মূল্যই নেই। কেননা, এই অস্বীকৃতি বাস্তবতার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবার যোগ্য।

উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক, যেমন- দু'জন সাধারণ ব্যক্তি রমযানের শুরুতে চাঁদ দেখার কথা প্রমাণ করলো অথচ এলাকার গণ্যমান্য, বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ হাজার হাজার ব্যক্তি অস্বীকার করে বলল, 'কোথায়? আমরা তো চাঁদ দেখিনি।' শরীয়তের মানদণ্ডে তাদের এই প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতি মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হবে। এর কারণ হলো, সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে একজন আরেকজনকে সমর্থন করে এবং সেই ব্যক্তির মতকে মজবুত করে। ফলে এতে পরস্পরের সহযোগিতা ও সমন্বয়তা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি এর বিপরীত। অতএব তা এক ব্যক্তি থেকে হোক অথবা হাজার ব্যক্তি থেকে হোক, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ, অস্বীকারকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি শুধু অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করার দিক দিয়ে পৃথক ও একক। এর কারণ সত্যায়নকারী বা স্বীকারকারী মূল বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করে। তারপর সে এর উপর আরোপিত বিধান প্রকাশ করে।

যেমন, আমাদের উদাহরণে বর্ণিত প্রেক্ষাপটে একজন বলল, "ঐ তো আকাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে।" আরেকজন এসে সেই স্থানটিকে দেখল এবং তাকে সত্যায়ন ও সমর্থন করল। ফলে দু'জনেই ঐ নির্দিষ্ট স্থান দেখার ক্ষেত্রে সহমত গ্রহণকারী এবং পরস্পরের সমর্থক। দু'জনের দেখার বিষয়টি মজবুত ও সুদৃঢ় হলো। পক্ষান্তরে প্রত্যাখ্যানকারী ও অস্বীকারাকারীর ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই ভিন্ন। কারণ, সে তো ঐ স্থানটি দেখেই নি। তার তো দেখার সুযোগই হয়নি। সে শুধু অস্বীকার করে যাচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে,

(لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُ النَّفْيِ غَيْرِ الْخَاصِّ وَغَيْرِ الْمُحَدَّدِ مَكَانُهُ)

অর্থাৎ, "ব্যক্তি-বিশেষ বা নির্ধারিত স্থানের জন্যেই অস্বীকৃতি কাজে আসে।

সবার জন্যে বা সকল স্থানের জন্য এই অস্বীকৃতি কোনো কাজে আসবে না।" আলোচ্য বিষয়ের আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে, যখন আমি তোমার কাছে এই পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোনো একটি কিছুর অস্তিত্ব প্রমাণ করলাম। আর তুমি পৃথিবীতে এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করলে। তখন তোমার জন্য উচিত হবে সমগ্র পৃথিবীতে এর অনুসন্ধান করা। যাতে করে তুমি ঐ বস্তুর অস্তিত্বহীনতাকে প্রমাণ করতে পারো। যেটাকে আমি খুব সহজেই সাধারণ প্রচেষ্টাতেই প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। সেই বস্তুটির না থাকাকে এখন প্রমাণ করতে হলে তোমার দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে অতীত কালের গর্ভে প্রবেশ করা। গভীর অনুসন্ধান করা। তবেই তুমি এ কথা বলতে সক্ষম হবে যে, 'আসলে তা পাওয়া-ই যায় না।' কিংবা 'এমন কোনো কিছু সংঘটিত হয়-ই নি।'

যেহেতু অস্বীকারকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী মূল বিষয়টিই দেখেনি। তাই তারা তো শুধু নিজেদের ইচ্ছেমতো বুদ্ধি ও যুক্তির অনুকূলে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। তবে এটা সবার জন্য আবশ্যিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। একজনের কথা আরেকজনের কোনো উপকারেও আসতে পারে না। এর কারণ হলো, দেখার ও জানার পর্দা তো তাদের নিকট ভিন্ন ভিন্ন। তাদের কাছে জানা ও জ্ঞান লাভ করার উপায় উপকরণও বিভিন্ন। কারণ প্রত্যেকেই বলতে পারবে 'আমি অমুক বস্তু দেখিনি।' 'আমার মনে হয় এর অস্তিত্ব নেই।' অথবা 'আমার বিশ্বাস, তা পাওয়া যায় না।' কিন্তু তাই বলে কারো পক্ষে এভাবে বলা সম্ভব নয় 'প্রকৃতপক্ষে এর অস্তিত্বই নেই।' এই অস্বীকৃতির কথাটা যখন কেউ বলবে- বিশেষ করে সর্বজনীন ও সর্বকালীন ঈমানের বিষয়াবলির ক্ষেত্রে- তখন তার কথাটা হবে মহাঅপবাদ ও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অপলাপ। তা কখনোই সত্য হতে পারে না এবং সঠিক মনে করাও সম্ভব নয়। আর কখনো তো সেটাকে সত্যের সাথে মূল্যায়নও করা যাবে না।